৮

আধুনিক শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
Sociological Basis of Modern Education

প্রস্তাবনা

আধুনিক শিক্ষা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনাদর্শের স্বার্থে প্রথাগতভাবে কোনো দর্শনতত্ত্বের (Philosophy) উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলা যায় না। আধুনিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তার সমন্বয়ধর্মিতা। বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় ঘটেছে শিক্ষাচিন্তার মধ্যে। শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে যেমন বিভিন্ন জীবনাদর্শের সমন্বয় ঘটেছে, তেমনি বিভিন্ন বস্তুনির্ভর ও সামাজিক বিজ্ঞানের (Social science) সমন্বয় ঘটেছে। তাই আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ কোনোটিকে উপেক্ষা করেনি। বর্তমানে শিক্ষার মূল দুটি কাজ হল, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে ব্যক্তিকল্যাণ সাধন করা এবং সামাজিক রীতিনীতি সংরক্ষণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করে, সামাজিককল্যাণ সাধন করা। দর্শনের বিভিন্ন শাখা সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার অভিমুখিতা নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের, বিশেষভাবে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষা তার কৌশলগুলি রচনা করেছে। এই কারণেই আধুনিক কালে শিক্ষাকে এক প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবে, সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানগুলি আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন নীতি ও ব্যবহারিক কৌশল নির্ধারণে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে শিক্ষার এই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যার (Sociology) যে প্রভাব এসে পড়েছে, তাকেই বলা হয়, শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Sociological foundation of education)। আধুনিক তাৎপর্যে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে কেন সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেন এবং সমাজবিদ্যা কীভাবে এবং কোন্ কোন্ দিক থেকে শিক্ষার ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছে সেই বিষয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষা ও সমাজ
Education and Society

সূচনা

আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে এক প্রকারের জীবনবিকাশের প্রক্রিয়া (Process of development) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবার পাশাপাশি তাঁরা শিক্ষাকে এক প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, শিক্ষা (Education) এবং সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই ধারণাই তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই আধুনিক শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হলে শিক্ষা এবং সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাধারণ অর্থে 'সমাজ' বলতে একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে বসবাসকারী একটি মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়। কিন্তু, সমাজবিজ্ঞানিগণ, সমাজ কথাটি (Society) এত সাধারণ ও নিষ্ক্রিয় অর্থে ব্যবহার করেন না। তাঁরা 'সমাজ' বলতে একটি সক্রিয় মানবগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন। যেমন, সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) 'সমাজ'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—সমাজ এমন এক সমমানসিকতাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী যার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি, এই মানসিকতার সাদৃশ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে, সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি চরিতার্থ করার জন্য একত্রে কাজ করতে সক্ষম হয় (A number of like-minded individuals, who know and

enjoy their like–mindedness and are therefore, able to work together for common ends) গিডিংস (Giddings) প্রদত্ত সমাজের এই সংজ্ঞায় "Who enjoys their like-mindedness" (যারা নিজেদের সম-মানসিকতাকে উপভোগ করে) কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটির তাৎপর্য হল এই যে, সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগণ পরস্পর পরস্পরের মানসিক অনুভূতিগুলির ও প্রতিক্রিয়াগুলির মাধ্যমে এক আনন্দদায়ক আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। আর সেই আত্মিক সম্পর্ক তাদেরকে সমবেতভাবে সমাজাদর্শগুলির প্রতি আকৃষ্ট করে। আধুনিক সমাজবিদ্যায় (Sociology) সমাজ অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেকার সচেতন (Conscious) আত্মিক সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপটি জানা থাকলে শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্কও জানা সহজ হবে।

সামাজিক প্রক্রিয়া
Social Process

সামাজিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞানিগণ মনে করেন, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে আত্মিক সম্পর্ক (Relation) তাদের সক্রিয়তার (Activity) দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই সক্রিয়তা আছে বলেই, যে-কোনো নির্দিষ্ট সমাজ তার নিজস্ব একান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং তার অগ্রগতির ধারাকেও বজায় রাখতে পারে। এই ধরনের সক্রিয়তা সমাজের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে বিশেষ একটি নীতি অনুসরণ করে। সাধারণত, কোনো একজন ব্যক্তির একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social response) অপর একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই পূর্ববর্তী অপর প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্তির নিজেরও হতে পারে অথবা সমাজ অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তিরও হতে পারে। এভাবে যখন সামাজিক প্রতিক্রিয়া অপর একটি প্রতিক্রিয়াকে অনুসরণ করে বা পূর্ববর্তী প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হতে থাকে তখন তাকে বলা হয় সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process)। সমাজবিদগণ বলেছেন, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজবদ্ধ ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তাই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। বিভিন্ন সমাজ-সংস্থার মধ্যেকার প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন সমাজ-সংস্থার মধ্যেকার প্রতিক্রিয়া এই সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সমাজবিদগণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সংঘটিত এই সামাজিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে, তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন। তাঁরা এরকম প্রায় শতাধিক সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সব সামাজিক প্রক্রিয়ার সবগুলি সম্পর্কে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শিক্ষার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সাধারণধর্মী কয়েকটি সামাজিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটন করলে, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া

বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার (Social process) মধ্যে যেগুলি প্রায়ই সংঘটিত হয় এবং যেগুলি প্রায় সকল রকম মনুষ্যসমাজেই দেখা যায়, সেগুলিকে সমাজবিদ্যায় মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া (Fundamental social process) হিসাবে অভিহিত করা হয়। সর্বজনীন মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলে, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং শিক্ষাকে আধুনিককালে কেন সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয় তা সহজে বোঝা যাবে। যে মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে সেগুলি হল—পারস্পরিক ক্রিয়া (Process of interaction), সামাজিকীকরণ (Socialization), বিরোধিতা ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া (Process of opposition and co-operation), সহাবস্থান (Accommodation) কৃষ্টিমূলক সমন্বয়ন এবং আত্তীকরণ (Assimilation)।

পারস্পরিক ক্রিয়া

1 পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া যেটি ছাড়া সমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। সমাজ এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের তন্ত্র (Society is a system of human relationship)। কিন্তু সমাজ অন্তর্ভুক্ত মানুষ মাত্রেই পরিবর্তনশীল। প্রতিযোগিতা (Competition), বিবাদ (Rivalry), সহযোগিতা (Co-operation), অভিযোজন (Adaptation) ইত্যাদির মাধ্যমেই তার এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সব কৌশলগুলি

কার্যকরী হয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু সবরকমের পারস্পরিক ক্রিয়াকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে সকল পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদের মনোভাব (Attitude) প্রভাবিত হয়, সেগুলিকেই সামাজিক দিক থেকে পারস্পরিক ক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁরা বলেছেন— "Interaction is a system of response which brings about desirable changes in the social attitude and behaviour of the individual, through a dynamic organisation of the response pattern।" অর্থাৎ, যে প্রতিক্রিয়াসমূহের সমন্বয় নিজেদের মধ্যে পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণ ও মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাকেই সামাজিক দিক থেকে বলা হয় পারস্পরিক ক্রিয়া। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র যে একক ব্যক্তির আচরণ ও মনোভাবের পরিবর্তন হয় তা নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের মনোভাব ও রীতিনীতির পরিবর্তন হয়। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ কিংসলে ডেভিস (Kingslay Davis) বলেছেন— "Social interaction involves contact, and contact necessarily requires a material or sensory medium।" কিংসলে-এর এই মন্তব্য পারস্পরিক ক্রিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। এই বৈশিষ্ট্য দুটি হল—পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য সাহচর্য (Contact) প্রয়োজন। এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি পরিবহন মাধ্যমে (Medium) থাকা বাঞ্ছনীয়। পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সাহচর্যে (Contact between individual and group) ঘটে থাকে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ায় এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিতে মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ পরিবাহিত হয়। সুতরাং পারস্পরিক ক্রিয়া সমাজ অন্তর্ভুক্ত মানুষের অন্তর্নিহিত একটি গতিধর্মী প্রক্রিয়া। এই ক্রিয়ার প্রভাবে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়। সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং ব্যক্তি উন্নত আচরণধারার অধিকারী হয়।

সামাজিকীকরণ

2 মানবশিশু জন্মসূত্রেই একটি সমাজের সদস্য পদ লাভ করে। সে সমাজপরিবেশের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। সমাজ-সংস্কৃতির যে ধারা প্রবহমান, শিশু জন্মমুহূর্তে সেই প্রবাহের ধারায় প্রাকৃতিক নিয়মেই স্থাপিত হয়। সে ওই সমাজপরিবেশের মধ্যেই বড়ো হতে থাকে। এই সময় বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা (Social institutions) শিশুকে প্রভাবিত করতে থাকে। যেমন, জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিশু তার পরিবারের মধ্যে নিজস্ব অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। এখানেই পরিবারের সদস্যদের প্রভাবে তার বাচনিক বিকাশ (Language development) শুরু হয় এবং তার ফলে শিশু অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিশু তার সামাজিক মর্যাদা (Social status) সম্পর্কে সচেতন হয়। সামাজিক মর্যাদা হল ব্যক্তির কতকগুলি অধিকার এবং কর্তব্যের সমবায় (Collection of some rights and duties of social individual)। সামাজিক ব্যক্তির এই মর্যাদা দু প্রকারের হয় **1** কতকগুলি আরোপিত মর্যাদা (Ascribed status) এবং **2** কতকগুলি অর্জিত মর্যাদা (Acquired status)। পরিবার বা সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোর দরুন জন্মের সাথে সাথে শিশুর উপর কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য বর্তায়। যেমন—বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামোয় ভারতে একজন কৃষকের সন্তান কৃষকের মর্যাদা লাভ করে। ব্রাহ্মণসন্তান অনুরূপ নিয়মে ব্রাহ্মণের মর্যাদা লাভ করে ; একজন ধনীগৃহের শিশু ধনীর মর্যাদা জন্মসূত্রেই পায়। এই জাতীয় মর্যাদাকে বলা হয় আরোপিত মর্যাদা। অন্যদিকে, শিশু তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার সুযোগ পায়। এই সমস্ত দল বা উপদলের সদস্য হিসাবে সে কতকগুলি মর্যাদা (status) সম্পর্কে সচেতন হয়। যেমন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণকালে, শ্রেণির 'ক্যাপ্টেন' বা মনিটর হয় ; সামাজিক কোনো সংস্থায় সম্পাদক বা কর্মকর্তা হিসাবে নির্বাচিত হয়। এই জাতীয় মর্যাদাগুলি ব্যক্তি তার নিজ প্রচেষ্টায় অর্জন করে। তাই এগুলিকে বলা হয় অর্জিত মর্যাদা (Acquired status)। এই প্রত্যেকটি মর্যাদার সঙ্গে কতকগুলি অধিকার এবং কর্তব্য যুক্ত থাকে। অর্থাৎ, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ তার মর্যাদা বলে, শুধুমাত্র কতকগুলি অধিকারই অর্জন করে না, ওই মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলি তার পক্ষে করণীয় বিবেচিত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী রালফ্ লিন্টন

(Ralph Linton) বলেছেন— "There is no roles without statuses or statuses without roles." এই কর্তব্য (roles) হল মর্যাদার সক্রিয়তার দিক। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হয়। মানবশিশু জন্মের পরবর্তী কালে সমাজের মধ্যে বসবাসের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় এই কর্তব্যগুলি পালন করার কৌশল আয়ত্ত করতে থাকে তাকেই সমাজবিজ্ঞানিগণ নাম দিয়েছেন, সামাজিকীকরণ (Socialization)। অর্থাৎ, যে প্রক্রিয়ায় সমাজের অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ব্যক্তি তার সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি সম্পাদনের কৌশল আয়ত্ত করে, তাই হল সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (Socialization process)। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজের অপেক্ষাকৃত নবীন সদস্যগণ প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি আচারআচরণ ইত্যাদিগুলিকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, এই সামাজিকীকরণের সহায়তায় সমাজ তার নিজের বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে সঞ্চালিত করতে পারে। এই কারণে সামাজিকীকরণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকপ্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং সামাজিক সংস্কারগুলি সংরক্ষিত হয়।

বিরোধের প্রক্রিয়া

[3] যেহেতু সমাজবিজ্ঞানিগণ সমাজকে সমমানসিকতাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী হিসাবে বর্ণনা করেছেন সেহেতু অনেকের ধারণা, এটি এমন একটি গোষ্ঠী যেখানে পারস্পরিক বিরোধিতার কোনো অবকাশ নেই। তাই যে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়, তাকে গতানুগতিক ধারণায় কলুষিত সমাজ হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানিগণ এ বিষয়ে বিপরীত মতবাদ পোষণ করেন। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধিতাকেও (Opposition) এক প্রকারের সামাজিকপ্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা বলেন বিরোধিতাও (Opposition) এক ধরনের সামাজিকপ্রক্রিয়া কারণ, এই প্রক্রিয়ার দরুন সামাজিক বিকাশ হয়ে থাকে। কোনো আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (Desired object) লাভ করার জন্য বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে (Specific goal) পৌঁছানোর জন্য বা কোনো আদর্শ বা মূল্যবোধ (Ideal or value) অর্জনের জন্য সমাজবদ্ধ মানুষ যখন পরস্পরের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় বিরোধিতার প্রক্রিয়া (Process of opposition)। সামাজিক পরিবর্তনের (Social change) জন্য এই প্রক্রিয়া অনেকাংশে দায়ী। সমাজের মধ্যে যখন সংস্কার আন্দোলন (Social reforms) চলতে থাকে তখন এই ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। সমাজের মধ্যে এই বিরোধিতার প্রক্রিয়া দুভাবে ঘটে থাকে— [1] পারস্পরিক প্রতিযোগিতার (Competition) মাধ্যমে এবং [2] পারস্পরিক দ্বন্দ্বের (Conflict) মাধ্যমে।

বিরোধের প্রক্রিয়া-প্রতিযোগিতা

যখন কোনো সমাজের সদস্যগণ নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত কোনো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা করে বা বিভিন্ন সমাজ বা সামাজিক সংগঠন (Social organisation) একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা করে, তখন তাকে বলা হয় প্রতিযোগিতা (Competition)। এই বিরোধিতার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের বা সংস্থাগুলির মনোযোগ থাকে নির্বাচিত লক্ষ্যের উপর ; ব্যক্তি বা সংস্থা হিসাবে পরস্পরের দিকে নয়। অর্থাৎ, এই ধরনের বিরোধিতা প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি হল, এখানে বিরোধীদের উদ্দেশ্য হল লক্ষ্যে পৌঁছানো বা পুরস্কৃত হওয়া ; অপরকে বিব্রত করা নয়। প্রতিযোগিতামূলক এই বিরোধিতার প্রক্রিয়া সবসময় সামাজিক নিয়মের (Social law) নিয়ন্ত্রণে থাকে। নিয়মবহির্ভূত বিরোধিতা সংঘটিত হলে, তা আর প্রতিযোগিতা থাকে না। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিযোগিতা (Competition) ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের বিবর্তনে এবং পরিবর্তনে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করে যেমন— [1] প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে নিজেকে ক্রমোচ্চশীল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তা ছাড়া এই প্রক্রিয়ার ফলাফলের দরুন সামগ্রিকভাবে সমাজেরও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। [2] প্রতিযোগিতার দরুন সমাজের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি (Economic, scientific and technological development) হয়ে থাকে এবং তার পরোক্ষ প্রভাবে ব্যক্তির কর্মসামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। [3] প্রতিযোগিতা ব্যক্তিমনে আত্মতুষ্টির (Self-satisfaction) মনোভাব জাগরিত হয় এবং তার ফলস্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব সমাজ জীবনে বসবাসের জন্য আত্মগরিমা (Positive self-feeling) অনুভব করে। [4] প্রতিযোগিতার

প্রক্রিয়া সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার সুষম বণ্টনে সহায়তা করে। কারণ সমক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব বণ্টন করে নিতে পারে। 5 প্রতিযোগিতা সামাজিক নিয়মাধীন হওয়ায়, তার প্রভাব সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সদস্যদের অন্তরে নিয়মশৃঙ্খলা অনুসরণ করার প্রবণতা সঞ্চার করতে পারে। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়া মানুষের সামাজিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করতে পারে। এই দিক থেকে প্রতিযোগিতাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল (Means of social control) হিসাবেও বিবেচনা করা যায়।

বিরোধের প্রক্রিয়া-দ্বন্দ্ব

পারস্পরিক বিরোধিতার আর একটি রূপ হল, দ্বন্দ্ব (Conflict)। এই প্রক্রিয়া একটি বিশেষ সমাজ অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সংঘটিত হতে পারে। এই জাতীয় বিরোধিতা প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বা আকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তুকে লাভ করার জন্য ব্যক্তি অন্যান্যদের সমইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে বিরোধিতা করে। প্রতিযোগিতা (Competition) এবং দ্বন্দ্ব (Conflict) উভয়েই সামাজিক বিচারে বিরোধিতার প্রক্রিয়া (Process of opposition) কিন্তু তাদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। তাদের মধ্যেকার এই পার্থক্যগুলি নির্দেশ করলে, দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ার প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। **প্রথমত,** প্রতিযোগিতার মূল কেন্দ্র হল লক্ষ্য (Goal) বা ইপ্সিত বস্তু (Object)। অন্যদিকে, দ্বন্দ্বের মূল কেন্দ্র হল ব্যক্তি (Individual)। দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতা বিনাশ করার প্রবণতাই প্রাধান্য পায়। **দ্বিতীয়ত,** প্রতিযোগিতার কিছু নিয়ম থাকে। তাই এই প্রক্রিয়া ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ সম্পাদনে অনুপ্রেরণা জোগায়। কিন্তু দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া কোনো নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে না। তাই অনেক সমাজবিজ্ঞানী দ্বন্দ্বকে নিয়মবিরুদ্ধ বা শৃঙ্খলাহীন প্রতিযোগিতা হিসাবে অভিহিত করেছেন। **তৃতীয়ত,** প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার প্রভাবে ব্যক্তি যে আচরণগুলি সম্পাদন করে, সেগুলি পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়, কিন্তু দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণের সেরূপ কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণগুলি হয় সামঞ্জস্যহীন এবং অস্থায়ী বা সাময়িক। **চতুর্থত,** প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব উভয় প্রক্রিয়াই লক্ষ্যাভিমুখী হলেও লক্ষ্যের গুণগত মানের দিক থেকে পার্থক্য থাকে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্বাচিত লক্ষ্যটি সামাজিক দিক থেকে আদর্শ স্থানীয় এবং উন্নত পর্যায়ের হয়।

প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের পার্থক্য

প্রতিযোগিতা (Competition)	দ্বন্দ্ব (Conflict)
প্রতিযোগিতা লক্ষ্যকেন্দ্রিক	দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক
প্রতিযোগিতা নিয়মতান্ত্রিক	দ্বন্দ্ব শৃঙ্খলাবিহীন
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন হয়	দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ব্যক্তির যে আচরণের পরিবর্তন হয় তা ক্ষণস্থায়ী
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সামাজিক লক্ষ্যটি হয় উন্নত পর্যায়ের	দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সামাজিক লক্ষ্য হয় অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের এবং মূলত বস্তুধর্মী
প্রতিযোগিতার সময় প্রতিযোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে পারে।	দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো অবকাশ থাকে না।

অন্যদিকে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে লক্ষ্য নির্বাচন করে, তা মূলত বস্তুধর্মী ; তাই অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। **পঞ্চমত,** প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, প্রতিযোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে পারে। কিন্তু দ্বন্দ্বের সময় ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধ হয় না। দ্বন্দ্ব (Conflict)

এবং প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়ার এই পার্থক্যের দিকগুলি থেকে আপাতভাবে প্রতীয়মান হয় যে দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া কেবলমাত্র সামাজিক বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করতে পারে, তবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত সবক্ষেত্রে সত্য নয়। দ্বন্দ্বও একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজজীবনে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কুফল আছে ঠিকই, তার সুফলও কিছু আছে। যেমন— [1] দ্বন্দ্ব দলগতভাবে মনোভাব (Attitude) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং সমাজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। [2] দ্বন্দ্বের ফল হিসাবে যে গোষ্ঠী জয়ী হয়, সেই গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এইভাবে গোষ্ঠী প্রভাবের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং আরও ব্যাপকতর সমাজজীবনের সূচনা হয় [3] দ্বন্দ্বের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের মধ্যে নতুন নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। এই মূল্যবোধগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বলে, সেগুলি স্থায়িত্বলাভ করে। [4] দ্বন্দ্বের ফলে, সমাজের মধ্যে এক শ্রেণির ব্যক্তির আধিপত্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়া সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। মার্কসীয় সমাজদর্শনে, সামাজিক এই প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই সামাজিক বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ার তাৎপর্য অনেক বেশি।

সহযোগিতা (Co-operation) আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় সমাজবদ্ধ জীব কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একত্রে সক্রিয় হয়, তাকেই সমাজবিজ্ঞানিগণ বলেছেন, সহযোগিতা। এই পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো সমাজের অস্তিত্বের কথাই ভাবা যায় না। সদস্যদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই সমাজ গঠিত হয় ; আর এই সহযোগিতার দরুনই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাব (Mutual understanding) গড়ে ওঠে। সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে দুপ্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ করা যায়— [1] প্রত্যক্ষ সহযোগিতা (Direct co-operation) এবং [2] পরোক্ষ সহযোগিতা (Indirect co-operation)। সামাজিক জীবনের এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে একাধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পরস্পরকে সরাসরি সাহায্য করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। এই ধরনের সহযোগিতাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। এই ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। আবার অনেক সময় একই সমাজের সদস্যরা একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করে। তাদের সমবেত প্রচেষ্টার ফল হিসাবে উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ হয়। বর্তমানে সমাজের অন্তর্গত বৃহৎ উৎপাদন সংস্থাগুলিতে কর্মীদের মধ্যে এই ধরনের সহযোগিতা দেখা যায়। এখানে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে অনেক সময় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। তাই এই জাতীয় সহযোগিতাকে পরোক্ষ সহযোগিতার প্রক্রিয়া বলা হয়। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে সহযোগিতা সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতিতে (Social change & social progress) নানা দিক থেকে সহায়তা করে। যেমন— [1] সমাজের মধ্যে সহযোগিতার প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় বলেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বণ্টন, নিশ্চিতভাবে করা সম্ভব হয়। [2] সহযোগিতা প্রক্রিয়ার জন্যই সমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমাজ-অগ্রগতির পরিকল্পনাকে সহজে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হন। [3] সহযোগিতার মনোভাবের জন্যই সমাজের বিভিন্ন সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার মতবিরোধ ভুলে আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একত্রে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হন। [4] এই সহযোগিতার প্রক্রিয়া যখন বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সংঘটিত হয়, তখন তা বৃহত্তর মানবকল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হয়। [5] পারস্পরিক সহযোগিতার প্রক্রিয়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মনে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ভাব দূর করে, সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ়তর করতে সহায়তা করে।

সহযোগিতার প্রক্রিয়া

সহাবস্থান (Accommodation) সমাজজীবনের আর-এক ধরনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। যে সামাজিক প্রক্রিয়ার দরুন সমাজ অন্তর্গত দুটি গোষ্ঠী বা দুটি ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতায় সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হয়, তাকে বলা হয় সহাবস্থান। সাধারণত বিরোধিতা প্রক্রিয়াকে এই সহাবস্থানের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে (Accommodation follows opposition)। সমাজবিজ্ঞানিগণ সহাবস্থানকে এক প্রকারের সামাজিক অভিযোজন (Social

সহাবস্থান প্রক্রিয়া

adjustment) প্রক্রিয়া হিসাবেও বিবেচনা করেন। সমাজজীবনে এই সহাবস্থান প্রক্রিয়ার তিনটি রূপ দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়ার এক একটি রূপ লক্ষ করা যায়। যেমন— [1] সমাজের মধ্যে যখন দুজন ব্যক্তি বা দুটি গোষ্ঠী প্রায় সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তখন তারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা না করে, কিছুটা দেওয়া-নেওয়ার নীতিতে (Give and take principle) কাজ করে এবং সংঘাত এড়িয়ে সহাবস্থান করে। এই ধরনের সহাবস্থানের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সহযোগী সহাবস্থান (Co-ordinate accommodation)। [2] অনেক সময় সমাজের মধ্যে দুজন ব্যক্তি বা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে এক পক্ষ জয়ী হয়। এমত অবস্থায় অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বশ্যতা স্বীকার করে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে সহাবস্থান করে। এই জাতীয় সহাবস্থানের প্রক্রিয়াকে বলা হয় আনুগত্যমূলক সহাবস্থান (Subordinate accommodations)। [3] সামাজিক জীবনে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সেখানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে আঘাত করতে চায় না, অথচ তাদের মধ্যে কোনো প্রকার বোঝাপড়াও সম্ভব নয়। এমত অবস্থায় তারা পরস্পরকে সহ্য করে এবং সহাবস্থান করে। এই অবস্থায় উভয়পক্ষেরই মূল দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই জাতীয় সহাবস্থানের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সহনশীল সহাবস্থান (Accommodation of tolerance)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে -কোনো নীতির ভিত্তিতে দুটি গোষ্ঠী বা সমাজ অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তি সহাবস্থান করুক না কেন, সহাবস্থান এক প্রকারের সামাজিক অভিযোজনের প্রক্রিয়া (Process of social adjustment)। তাই এই প্রক্রিয়া সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সমন্বয়ন প্রক্রিয়া

সমন্বয়ন (Acculturation) ও এক প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতি ও কৃষ্টিসম্পন্ন দুই বা ততোধিক গোষ্ঠী একত্রে সংযুক্ত হয়ে একটি একক সামাজিক আচরণমূল্যের তন্ত্র (System of social-behavioural value) গড়ে তুলতে পারে, তাকেই বলা হয় সামাজিক সমন্বয়নের প্রক্রিয়া (Acculturation process)। দুই বা তার বেশি সামাজিক গোষ্ঠী তাদের মধ্যে সান্নিধ্যগত সংযোগের দরুন পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং কালক্রমে তাদের ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টিগত উপাদানগুলির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি একক সমন্বয়ী কৃষ্টির (Integrated culture) সৃষ্টি হয়। সমাজবিজ্ঞানিগণ এই সমন্বয়নকে এক প্রকারের কৃষ্টি পরিমার্জনের প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সংস্থা (Trade and Commerce), শিল্প সংস্থা (Industry), ধর্মীয় সংস্থা (Religion), শিক্ষা সংস্থা (Education) ইত্যাদির মতো সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে গোষ্ঠীগত সাজুয্যের দরুন, এই ধরনের সমন্বয়ন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

আত্তীকরণ প্রক্রিয়া

অনেক দিক থেকে সমন্বয়ন প্রক্রিয়ার (Acculturation) সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, এরকম আর-একটি প্রক্রিয়া হল আত্তীকরণের প্রক্রিয়া (Assimilation process)। যে প্রক্রিয়ায় দুটি সামাজিক গোষ্ঠী তাদের পারস্পরিক প্রভাবের দরুন একে অপরের সামাজিক আদর্শগুলিকে (Social ideals) গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তাকে সমাজবিজ্ঞানিগণ বলেছেন আত্তীকরণের প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয়, সমন্বয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানত আচরণ রীতির (Mode of behaviour) বিবর্তন হয় ; অপরদিকে, আত্তীকরণের প্রভাবে সামাজিক গোষ্ঠীর, সামাজিক দর্শনের (Social Philosophy) পরিবর্তন হয়। তাই, সমাজাদর্শের পরিবর্তনের (Change of social ideals) প্রক্রিয়াকেই আত্তীকরণ বলা হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানিগণ মনে করেন, আত্তীকরণের মাধ্যমেই সামাজিক বিবর্তন (Social evolution) ঘটে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানিগণ এবং সমাজদার্শনিকগণ মনে করেন, গোষ্ঠীজীবনের ধারাবাহিকতা এবং বিবর্তন ক্রমাগতভাবে এই সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁরা যে বহু প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক প্রক্রিয়া গুলির (Basic process) সাধারণ বিবরণ এখানে দেওয়া হল। কিন্তু, প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখার দরকার, উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যেটিকে মূল বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সেটি হল পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction)। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য সকল সামাজিক প্রক্রিয়াই পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারাই নির্ধারিত

হয়। এই কারণে, আধুনিক যে-কোনো আচরণ-বিজ্ঞানে (Behavioural science) ব্যক্তির আচরণের তাৎপর্য নির্ণয় করার জন্য, তার জীবনপরিবেশে সে যে পারস্পরিক ক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়, সেটিকেই বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও সমাজ
Education & Society

শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির উল্লেখ করার প্রধান উদ্দেশ্য হল, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কটি নির্ধারণ করা। কারণ, তাদের মধ্যেকার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারলে, আধুনিক শিক্ষাকে কেন এক প্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয় এবং কেন বিভিন্ন শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজবৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি প্রয়োগ করা হয়, তা সহজে উপলব্ধি করা যাবে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজবদ্ধ প্রত্যেক জীব, পর্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে যে-কোনো একটি সামাজিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের এই প্রতিক্রিয়াগুলির সমতাই সামাজিক প্রক্রিয়ার (social process) পরিচায়ক। সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে এবং সামাজিক অগ্রগতির ধারাও বজায় থাকে। আধুনিক তাৎপর্যে শিক্ষাকেও (Education) অনুরূপ একটি উন্নয়নশীল বহমান প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জন ডিউই (Dewey) এই অর্থেই বলেছেন "Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences।" শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে ক্রমাগতই তাদের অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস ঘটাতে থাকে। তাদের সেই আত্মসক্রিয়তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়, তাদের পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Response) বা আচরণের (Behaviour) মধ্যে। এই কারণে, আধুনিক প্রথাগত শিক্ষায়, শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া বা আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়পরিবেশের মধ্যে দলবদ্ধভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। এই ব্যবস্থায় দলবদ্ধভাবে শিক্ষাগ্রহণকালে, তারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ, শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা সমাজানুরূপ একটি গোষ্ঠী (Community) গড়ে তোলে। সেই শিক্ষার্থী গোষ্ঠী (Student community) দলগতভাবে এবং তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে ক্রমপর্যায়ে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অর্থাৎ, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ যে প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে, সেগুলি ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয় এবং একটি প্রতিক্রিয়া অপরটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অনুসরণ করে (One response follows the other)। আবার, আধুনিককালে চিন্তাবিদগণ প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার সময় তার কতকগুলি লক্ষ্য স্থির করে থাকেন। শিক্ষার সেই লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার সামাজিক লক্ষ্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন। তাঁদের মতে শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক উন্নয়নে (Social development) সহায়তা করা। সুতরাং, শিক্ষার্থীগণ তাদের শিক্ষাকালে পর্যায়ক্রমে যে আচরণ বা প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে, সেগুলি উদ্দেশ্যমুখী এবং সেই উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল সমাজ-উন্নয়ন। শিক্ষার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, লক্ষ করা যায়, শিক্ষাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক প্রক্রিয়ার (Social process) বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য বর্তমান। যেমন—

শিক্ষা ও সামাজিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য

এক সমাজের মধ্যে যেমন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার (Interaction) সম্পর্ক লক্ষ করা যায় তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক দেখা যায়।

দুই সমাজজীবনের মতোই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাপরিবেশে, পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, একজন শিক্ষার্থী বা একজন শিক্ষকের আচরণ অন্যান্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আবার ওই প্রতিক্রিয়ার অনুসরণে, বিশেষ শিক্ষার্থী অপর এক প্রতিক্রিয়ার